দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 28 MAY 2003
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৩...

আমাদের শিক্ষার চেহারা কতটা উজ্জ্বল?

আবদুল মতিন

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড— এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর যারা সেই শিক্ষাদান করে তাদের আমরা শ্রদ্ধাভরে বলি মানুষ গড়ার মিস্ত্রি। কিন্তু আসলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কতটা উন্নতি হয়েছে, সে কথাটা বলা সহজ নয়। তবে একটি কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তা এখনও পুরোপুরিভাবে সন্তোষজনক নয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে সমস্যার সংখ্যাও কম নয়। গত ১৯ মে জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, ভ্যাকেশন ডিপার্টমেন্ট হিসাবে খ্যাত দেশের প্রায় ৩০ হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ছুটির পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষকদের জন্য চালু হচ্ছে অর্জিত ছুটি। বছরে বায়ান্নটি সাপ্তাহিক ছুটি বাদে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদিত কলেজে ৭৮ এবং স্কুলে ৮৫ দিন ছুটি রয়েছে। এসব ছুটির মধ্যে যেগুলো ছোটখাটো বা তুচ্ছ বলে গণ্য তা কাট বা ঐচ্ছিক ছুটি করা হবে। তবে কোন কোন ছুটি কাট বা ঐচ্ছিক হবে এবং বছরে কতদিন ছুটি কমানো হবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। এদিকে ছুটি কমানো এবং শিক্ষকদের অর্জিত ছুটি চালুর ব্যাপারে কলেজ শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক প্রতিনিধিদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের যুক্তি পাল্টাযুক্তি হয়েছে। গত শনিবার (১৭ মে) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক যৌথ সভায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি কমানো এবং শিক্ষকদের জন্য অর্জিত ছুটি চালুর ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা হয়। সভায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি কমিয়ে শিক্ষকদের জন্য অর্জিত ছুটি চালুর ব্যাপারে সরকারী-বেসরকারী কলেজ শিক্ষকরা একমত হন। স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষকরা একমত না হয়ে সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য এক সপ্তাহ সময় চেয়েছেন। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যেহেতু বছরে ৩৩ দিন অর্জিত ছুটি পান সেহেতু বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতিসহ কয়েকটি শিক্ষক সংগঠন অর্জিত ছুটি দাবি করে আসছে। কিন্তু এই অর্জিত ছুটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় দিতে চায় একটু অন্যভাবে। তা হলো কিছু ছুটি বাতিল বা ঐচ্ছিক করে ঐসব কর্মদিনে শিক্ষকরা কাজ করলে অর্জিত ছুটি পাবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কন্ট্রাক্ট আওয়ার বাড়াতে হবে।

এই উদ্যোগে শিক্ষকরা সাড়া দিলে অর্জিত ছুটি চালু হতে পারে। বর্তমানে স্কুল-কলেজে বছরে ২৭ দিন গ্রীষ্মকালীন ছুটি রয়েছে। সাধারণত গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলাকালে কলেজে এইচএসসি পরীক্ষা হয়। তাই ছাত্ররা ছুটি উপভোগ করলেও শিক্ষকরা পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত থাকেন। এই ২৭ দিন অর্জিত ছুটি হিসাবে গণ্য করার দাবি জানান কলেজ শিক্ষকরা। কিন্তু স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষকরা এর বিরোধিতা করেছেন। সভা সম্পর্কে শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি প্রফেসর মোহাম্মদ জুনাইদ বলেন, ভ্যাকেশন ডিপার্টমেন্ট হিসাবে খ্যাত শিক্ষা বিভাগকে নন-ভ্যাকেশন ডিপার্টমেন্ট করা এবং শিক্ষকদের অর্জিত ছুটি চালুর জন্য এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কন্ট্রাক্ট আওয়ার বাড়বে। এই একটি প্রয়োজনীয় বিষয়েও নানা ক্যাটাগরির শিক্ষকরা একমত হতে পারেননি। এ থেকে শিক্ষকদের মানস কাঠামোর একটি চিত্র পাওয়া যায়।

শিক্ষার মান যে ক্রমশ কমে যাচ্ছে সে সম্পর্কে এবার জনকণ্ঠের ১৮ মের একটি রিপোর্টের উদ্ধৃতি দেব। পাবলিক পরীক্ষাসমূহের ফলাফল মূল্যায়ন এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বহাল রাখা-না রাখা বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য এবার গঠন করা হচ্ছে 'সমীক্ষা দল' নামের একটি নতুন কমিটি। এই কমিটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে সেই আলোকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সরকারী অনুদান বহাল রাখা, কমিয়ে দেয়া বা প্রত্যাহারের সুপারিশ করবে। অবিলম্বে এ ধরনের একটি সমীক্ষা দল গঠনের জন্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শনিবার শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন।

পত্রিকান্তরে খবরে প্রকাশ, উত্তরাঞ্চলে সাম্প্রতিককালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার মান এতটা নিচে নেমে গেছে যে, গত ২০০১ সালে ডিগ্রী পরীক্ষায় ১৩টি কলেজের কোন পরীক্ষার্থী এবং ২০০১ সালে আলীম পরীক্ষায় ১৬৪টি মাদ্রাসার কোন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ না হওয়ায় উত্তরের ১৬টি জেলার মোট ১৭৭টি কলেজ-মাদ্রাসার এমপিও কেন বাতিল করা হবে না—এই মর্মে শোকজ নোটিস প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, শোকজ নোটিসের জবাব সন্তোষজনক না হলে ওই সব কলেজ ও মাদ্রাসার এমপিও বাতিল করা হবে। দেশের অতি নিম্নমানের তিন হাজার বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার মান উন্নয়নের জন্য শেষ পর্যন্ত এক মাসের সময় দেয়া হচ্ছে। এ সময়ের মধ্যে পাসের হার ও লেখাপড়ার মান সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত না হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এমপিওভুক্তি ও রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হবে। দাতা সংস্থা এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে অপচয় রোধের পরামর্শ দিলেও সরকার আপাতত হার্ডলাইনে না গিয়ে এক বছর সময় দিতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিম্নমানের ও নামসর্বস্ব প্রায় তিন হাজার প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানোর চিঠি দিয়েছে। চলতি মের শেষ সপ্তাহের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে জবাব দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান তো ক্রমশ নিচের দিকে নামছে।

চলতি মে মাসের আরেকটি খবরে প্রকাশ, 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে সারা দেশে ৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুখ থুবড়ে পড়েছে'। ওই দৈনিকে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, দেশের প্রায় ৩৫টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকারে পরিণত হয়ে বন্ধ হতে চলেছে। বেতনের সরকারী অংশ প্রাপ্তির অনুমোদন বা 'এমপিও'ভুক্ত হওয়ার মাত্র কয়েকদিন পরেই সরকার অদৃশ্য কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করে। পড়ালেখায় ভাল ফলাফল করা সত্ত্বেও এমপিও বাতিল হওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থের অভাবে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না। শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জীবন কাটছে কষ্টে। আরও একটি রিপোর্টে জানা যায় (৫ মে, জনকণ্ঠ), সরকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকারী-বেসরকারী সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জেলা এবং উপজেলা কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছে। এর আওতায় শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি গঠনের মাধ্যমে দলীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক বর্তমান কমিটিগুলোর ওপর এই নতুন কমিটিকে বসিয়ে দেয়া হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এইভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিলে সেখানে লেখাপড়ার মান কি খুব একটা বাড়বে? মনে তো হয় না। যাক কথায় বলে, 'সব ভাল তার শেষ ভাল যার' শেষটা না দেখে ঐ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করা সমীচীন মনে হচ্ছে না। আসলে দেশবাসী চায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা যাতে বাধা বিঘ্নহীন পরিবেশে শান্তিতে লেখাপড়া করতে পারে তা দেখতে। এবার নিরক্ষরতার অভিশাপ সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সম্প্রতি সিরাজগঞ্জ জেলাকে নিরক্ষরতামুক্ত ঘোষণা করেছেন। এ নিয়ে গত ৮ বছরে তিন সরকারের আমলে একে একে সাতটি জেলাকে নিরক্ষরতামুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারগুলোর মধ্যে এ ব্যাপারে আন্তরিক আগ্রহ থাকলেও কতগুলো কারণে এই লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না। জেলায় জেলায় মানুষকে 'যেভাবে সাক্ষর করা হচ্ছে তা উল্লেখ করে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এ পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে একটি জেলাও নিরক্ষরতামুক্ত হয়নি। ওয়াকিফহাল মহলের মতে, গত এক যুগে তিন তিনটি সরকারের আমলে সহস্রাধিক কোটি টাকা 'ব্যয় হয় 'নিরক্ষরতামুক্ত' ঘোষণার কর্মসূচীতে। 'কাগজে কলমে' এ পর্যন্ত ১ কোটি ৭০ লাখ মানুষকে সাক্ষর করা গেছে। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় এসব কর্মসূচী চলছে ২০০৬ সাল দূরের কথা; এমনকি ২০০২ সালেও নয়, ২০০০ সালের লক্ষ্যমাত্রাই এখনও অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এজন্য আর্থিক কেলেঙ্কারি, অস্বচ্ছতা ও আর্থ-সামাজিক কারণগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাক্ষর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একাধিক এনজিও কর্মকর্তা বলেছেন, দু'মাস বা ছ'মাসের চেষ্টায় একজন মানুষকে হয়ত লিখতে পড়তে শেখানো যায়, কিন্তু মানুষটি সেই শিক্ষা ধরে রাখতে পারে না। এজন্য জরুরী প্রয়োজন ফলোআপ কর্মসূচী। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফলোআপ কর্মসূচী নেই। ফলে যারা যা শিখেছিল, তাও ভুলে যাচ্ছে।

সত্যি কথা বলতে কি, অতীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের সময় ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে ব্যাপক আকারে সাক্ষরতা কার্যক্রম চালানোর সুপারিশ করা হয়। ১৯৯১ সালে শুরু হয় সমন্বিত উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম। ১৯৯৫ সালে গঠিত হয় উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা দফতর। আগে বয়স্ক ব্যক্তিদের ব্যাপারেই জোর দেয়া হতো। এখন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ঝরে পড়া এবং দরিদ্র পরিবারের মানুষদের এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হচ্ছে। আসলে সাক্ষরতা অভিযান বাস্তবে কি ফল দিচ্ছে, সে ব্যাপারে অনেকের অনেক প্রশ্ন আছে। কিন্তু সততা, স্বচ্ছতা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সাক্ষরতা অভিযানকে আমাদের সার্থক করে তুলতেই হবে। তাহলে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারব।

টুকরো গপ্পো

ব্যথা

বয়স্ক ভদ্রলোক : ডাক্তার সাহেব আমার বামপায়ে অসম্ভব ব্যথা

ডাক্তার : এটা আপনার বয়সের জন্য হয়েছে।

ভদ্রলোক : কিন্তু আমার ডানপায়ের বয়সও তো ঐ একই, ওটাতে তো ব্যথা হয়নি।

—সংগৃহীত